বিজ্ঞানের অংগনে যখন ধর্মের প্রবেশ

দুটোর যৌক্তিক পার্থক্য কি এতো সহজ?

রির্চাড ডকিন্স

অনুবাদক: তানবীরা তালুকদার

এক ধরনের কাপুরষোচিত বোধশক্তিজনিত মানসিক শিথিলতা কিংবা আপোষকামিতার কথা বাদ দিলে বিচারশক্তিসম্পন্ন যুক্তিবাদী লোকদের সিদ্ধান্তগুলো বরং যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধেই যায় (এখানে সাম্প্রতিক যুগের Scientology$_{(1)}$ অথবা Moonies$_{(2)}$ -এগুলোর কথা বিচার্য্য নয়)। স্টিফেন জে গুল্ড তার প্রাকৃতিক ইতিহাস কলামে পোপের বিবর্তনবাদ এর প্রতি আচরণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রবলভাবে তার আপোষকামী মনোভাবকেই প্রকাশ করে -

> "বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন সংঘাত নেই, সঠিক শিক্ষার অভাবে সেসব ক্ষেত্রে সহজেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমার সমস্ত অন্তকরন দিয়ে, একটি সম্মানজনক, একটি ভালোবাসাময় চুক্তি (আমি এটাকেই গুরুত্ব দেই) ...।"

যহোক, কি সেই দুটো সহজ দৃষ্টিতে পার্থক্যময় ক্ষেত্র, যাকে গুল্ড 'অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র বলয়' (Nonoverlapping Magisteria, সংক্ষেপে NOMA) নামে অভিহিত করেছেন - আর ধারনা করেছেন এদুটোকে আমাদের সমান উষ্ণভাবে সম্মান আর ভালোবাসা দিয়ে বুকে ধারণ করে রাখতে হবে? গুল্ড আরো বলেছেন, 'বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু ভৌত বাস্তবতার আলোকে প্রায়োগিক বিশ্বকে ধারণ করে। আর ধর্মের জ্ঞান মানুষের নৈতিক চিন্তা আর মূল্যবোধের ধারনাকে প্রসারিত করে।' কিন্তু সত্যই কি তাই?

নৈতিকতা কারা ধারণ করে ?

আসলে ব্যপারটা কি এতোই সরল? কিছুক্ষনের মধ্যেই আমি সে আলোচনায় যাবো যেখানে আসলে পোপ বিবর্তনবাদ বলতে কি বুঝিয়েছেন তার ভিত্তি তুলে ধরব এবং এরপর তার চার্চের অন্যসব স্বীকৃতির ব্যাপারেও কিছু কথা বলব। দেখবো আসলেই এগুলো এতো পরিস্কারভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাখা দেয় কি না। প্রথমেই সংক্ষিপ্ত আকারে ধর্মের সেই দাবী নিয়ে আলোচনা কারা যাক- যেখানে বলা হয় ধর্ম বিশেষ দক্ষ ভাবে আমাদের নৈতিকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে। এ ধারনাটি অনেক সময় অনেক অবিশ্বাসী লোকও সাদরে গ্রহন করেন, ধারনা করা হয়

সভ্যতার সাথে সাথে "মাথা নুয়ে" তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্বোচ্চ যুক্তিকে স্বীকার করে নেয়া - সে যতো দুর্বল যুক্তিই হোক না কেন।

প্রশ্ন হলো, “কোনটি ভুল এবং কোনটি ঠিক?” এটি একটি সত্যিকারের কঠিন প্রশ্ন যেটার উত্তর বিজ্ঞান হয়ত দিতে পারে না। নৈতিকতার অবয়ব দিয়ে কিংবা পূর্ববর্তী নৈতিক বিশ্বাস দিয়ে, গুরুত্বপূর্ন এবং কঠিন সব লৌকিক নৈতিক দর্শনের নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে একজনকে হয়তো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বিজ্ঞান এবং যৌক্তিক কারনের সাহায্যে এর সাথে জড়ানো সংশ্লিষ্ট গোপন বিশ্বাসকে, অলক্ষ্যনীয় সামঞ্জস্যহীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। কিন্তু চুড়ান্ত নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তি মানুষের অন্য কোন জায়গা থেকে আসা উচিৎ, অনুমান করা যায় যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বের কোন দৃঢ় প্রত্যয় থেকে। বিশ্বাসীদের দাবী অনুযায়ী এটা হয়ত আসে ধর্মের মাধ্যমে- মানে ঈশ্বর, ধর্মগুরু, সনাতন ঐতিহ্য, এবং একটি ঐশী বইয়ের মাধ্যমে এই নৈতিকতার টনিক বিতরন করা হয় - মানবজতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে, যে আশাটা ধর্ম দিতে পারে সেটা উষর প্রস্তরখন্ড ছাড়া কিছু নয়, সেখানে থেকে উৎপন্ন হওয়া বালির ভিত্তি সম নৈতিকতাগুলো একেবারেই নিস্ফলা। সত্যি বলতে কি- প্রাত্যহিক জীবনে কোন সভ্য মানুষই ধর্মগ্রন্থকে নৈতিকতার চূড়ান্ত বাহন হিসেবে পালন করে না। বরং আমরা নিজেদের পছন্দনীয় শ্লোক বা আয়াত ধর্মগ্রন্থ থেকে বেছে নেই (যেমন, 'ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই', 'প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার কর' -এধরনের হিতোপদেশ সমূহ), এবং সানন্দে অশোভন অংশটুকু বাদ দিয়ে দেই (যেমন বেগানা নারীকে বেত্রাঘাত, বা তাদের ব্যাভিচারের জন্য পাথর ছুড়ে হত্যা, স্বধর্মত্যাগীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যার আইন চালু করা, প্রতিপক্ষের বংশধরদেরকে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি)। পুরনো বাইবেলের যে সৃষ্টিকর্তা তিনি নিজেই এক নির্মম, প্রতিহিংসাপরায়ন, নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, নারী পুরুষের মধ্যে অযৌক্তিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং ভয়ংকর রক্তপিপাসু এক চরিত্র, আজকের সমাজে কোন ব্যাক্তি তাকে আর্দশ চরিত্র বলে মেনে নেবে না। হ্যা, অবশ্যই আমাদের আজকের সভ্যতার অর্জনের আলোকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিনীতিকে বিচার করা খুবই অনুচিত । আর সেটাই আমার “আসল” কথা! স্পষ্টতই, আমাদের কাছে নৈতিকতার কিছু চূড়ান্ত বিকল্প উৎস আছে, যা আমাদের সুবিধামতো ধর্মগ্রন্থকে পদদলিত করে হলেও সামনে এগিয়ে যায়।

সেই বিকল্প উৎসটিকে মনে হয় খুবই উদার মতের শালীন ধারার এবং প্রাকৃতিক ন্যায় বিচারক যা ইতিহাসের সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়, যখন যেই ধর্ম প্রচারক থাকে তার প্রভাবনুসারে নিয়মিত পরিবর্তন হতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, তা খুব কঠিন কিছু না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে, এমনকি আমাদের মধ্যে যারা খুব ধার্মিক তারাও এটাকে ধর্মগ্রন্থের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই কম বেশী ধর্মগ্রন্থকে অবহেলা করে থাকি, সে সমস্ত বানীগুলোকেই উদ্বৃত্ত করা হয় যেগুলো আমাদের উদার মানসিকতাকে ধারন করে আর যেগুলো করে না সেগুলোকে সযত্নে সজ্ঞানে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর যেখান থেকেই সেই উদারতা আসুক না কেনো, এটা আমাদের সবার জন্যই গ্রহনযোগ্য সে আমরা ধার্মিক হই কিংবা না হই।

অনুরূপভাবে, যীশু খ্রীষ্ট কিংবা গৌতম বুদ্ধের মতো মহান সব ধর্ম শিক্ষকরা, তাদের নিজেদের চারিত্রিক ভালো গুন দ্বারা আমাদেরকে অনুপ্রানিত করেন, তাদের ব্যাক্তিগত চরিত্রের দৃঢ়তা ও নৈতিকতাকে গ্রহন করার জন্য। কিন্তু আমরা আবার সেই ভালো কয়েকজন ধার্মিক নেতার মধ্যে থেকেই বাছাই এবং পছন্দের কাজটা করছি, জিম জোন্স অথবা চার্লস ম্যানসন এর মতো পাজী ধার্মিক নেতাদের বাদ দিয়ে। কিন্তু আমরা আর্দশ হিসবে জওহারলাল নেহরু কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো নীতিবান নেতাদেরও তো গ্রহন করতে পারি। প্রথাগতভাবে, যেহেতু যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে তাই ভালো কি মন্দ সে বিচার না করে, আমরা আমাদের নৈতিকতা আর শালীনতার বিচার এবং প্রকৃতি থেকে আহরিত জ্ঞান দিয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেই কোনটা গ্রহন করব আর কোনটা বর্জন করব।

বিজ্ঞানের অংগনে ধর্ম

আমরা নৈতিকতার মূল্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে মূল বিষয় থেকে দূরে সরে এসেছি। এখন আমি আমার মূল আলোচনা বিবর্তনবাদে ফিরে যাবো দেখব পোপ আমাদের প্রত্যাশানুযায়ী বিজ্ঞান-মনস্কতার ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরতে পেরেছেন কিনা। “Pontifical Academy of Sciences” কে তার বিবর্তনবাদের উপর দেয়া বানীটি শুরুই হয়েছে নেতিবাচকভাবে দুমুখো ভাবধারার কথা দিয়ে যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় জন পলের আগের উক্তির সাথে মিল রাখা। আরো সন্দেহজনক হলো বারোতম পিয়াসের একটি উক্তির অন্তর্ভুক্তি -যিনি অন্যান্যদের তুলনায় বিবর্তনবাদের প্রতি খুবই বিরূপ। এখন পোপ এলেন আরো কঠিন কাজ করতে, বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমানের সাথে “ঐশী প্রত্যাদেশের” মিলন ঘটাতে।

ধর্মগ্রন্থে বলা হয়, মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে এবং তার অবয়ব থেকে ... যদি মানুষ পুর্ববর্তী কোন জীবন থেকে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে তার ঐশ্বরিক আত্মা সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তা তৈরী করে দেন..... তারফলে তারা মনে করে জীবন্ত প্রানীর সব শক্তির আবির্ভাব হয় আত্মা থেকে, আর বিবর্তনবাদ শেখাচ্ছে পুরো উল্টোটা - আত্মা ছাড়াই কিভাবে প্রাণের বিকাশ আর বিবর্তন হতে পারে - নাকি নিছক দৃষ্টি আকর্ষন করার মত ব্যাপার কেবল এটা, মানুষের সৃষ্টির সাথে সম্পূর্ন সামঞ্জস্যহীন ..... এ দ্বিমুখী দন্দ্বে আমরা মানুষেরা নিজেরা অস্তিত্বের প্রশ্নে মনস্তাত্বিক একটা বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যাই, যেটাকে অস্তিত্বের বিষয়ে একটা বিরাট ফাকও বলা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে পোপকে একটা বাহবা দিতে হয় যে তিনি তখন অনুধাবন করেছেন যে সম্পূর্ন দুই মেরুতে অবস্থিত দুটো বিপরীতধর্মী ব্যাপারকে তিনি জোর করে এক করতে চাইছেন - "যাহোক এ ধরনের অস্তিত্বর বিষয়ে অবস্থান না গ্রহন করাটাই কি বাস্তবে পদার্থ এবং রসায়নের জগতে বিবর্তন এর উপর গবেষনার মূল ধারা নয়?'

ভয়ের কিছু নেই। অস্পষ্টতা আর নানাপদের আগডুম বাগডুম মুক্তির উপায় বাৎলে দিচ্ছে:

> 'জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে পদ্ধতি বহু বার ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা দুটো ভিন্নধর্মী মতামতকে এক করা সম্ভব হয়, যাদের এক হওয়াকে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন বর্ননা এবং পরিমাপের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করে ব্যাখা করে এবং সময়ের সাথে সাথে আরো নির্ভুল ভাবে একে জীবনের সাথে যুক্ত করে। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষ মূহুর্তকে এভাবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করা যায় না, তথাপি এটা একটা গবেষনামূলক স্তরের আবিস্কার -যা মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত অনেক নিদির্ষ্ট মূল্যবান জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করে।'

সোজা ভাষায় বলতে গেলে, বিবর্তনবাদের নিদির্ষ্ট একটা লক্ষ্যে পৌছার একটা সময় এলো যখন সৃষ্টিকর্তা মানুষের আত্মাকে পূর্ববর্তী প্রানীর বংশের মধ্যে অন্তর্গত এবং সঞ্চারিত করলেন। (কখন? দশ লক্ষ বছর আগে? বিশ লক্ষ বছর আগে? *Homo erectus* আর জ্ঞান সম্পন্ন *Homo sapiens* মানুষের মধ্য? নাকি *Homo sapiens* মানুষ আর *H. sapiens sapiens* - মানুষের মধ্যে?) হঠাৎ করে আত্মা সঞ্চারনের অবশ্যই দরকার আছে, নইলে তো মানবজাতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ধর্মের ভিত্তিই ধ্বসে পড়ে। তুমি আহারের জন্য প্রানী হত্যা করতে পারো, কিন্তু ভ্রুন হত্যা কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধীতে আক্রান্ত মানুষের যন্ত্রনাহীন মৃত্যু তাদের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক জীব হত্যা, কারন -এক্ষেত্রে মহামূল্যবান 'মানব জীবনের' প্রশ্ন জড়িত।

ক্যাথলিজমের জাল কেবল নৈতিক বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবলে ভুল হবে। ক্যাথলিক ধর্মানুসারীরা বিশ্বাস করে আধুনিক সভ্য *Homo sapiens* মানুষের সাথে অন্য সমস্ত 'ইতর প্রানী জগতের' একটি বিরাট বিভেদ আছে। আর বিজ্ঞানের চোখে এই বিভেদ একেবারেই ভ্রান্ত। বলা নিষ্প্রয়োজন, আজকের যুগে আকস্মিক ভাবে কোন ধরনের অমর আত্মার মাধ্যমে প্রানের বিকাশের কথা বিবর্তনবাদের কাছে বৈজ্ঞানিক ভাবে অগ্রহনযোগ্য।

আরো সাধারনভাবে বলতে গেলে, এটা বলা খুবই অযৌক্তিক, যেমন গুল্ডস এবং অন্যান্যরা বলে থাকেন, যে 'ধর্ম নিজেই বিজ্ঞানের অংগন থেকে দূরে অবস্থান করে, এবং শুধু নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।' ঈশ্বার নামকএকটি অলৌকিক সত্ত্বা দ্বারা সৃষ্ট এবং তার দ্বারা বিরাজিত মহাবিশ্ব, প্রকৃতগতভাবে এবং গুনগতভাবে ঈশ্বরবিহীন মহাবিশ্ব থেকে আলাদা হওয়ারই কথা। আর সেই বিভেদটিই হলো অপরিহরনীয় বৈজ্ঞানিক পার্থক্য। ধার্মিকেরা যে সত্ত্বার অস্তিত্বের দাবী করে, তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের বৈজ্ঞানিক দাবীকেই উপস্থাপন করতে চায়।

প্রধান প্রধান রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলোর বেশীর ভাগই এই ধরনের দাবীর প্রতি আস্থাশীল। বিনা ঔরসে কুমারীর মাতার সন্তান প্রসব, কুমারী মেরীর সশরীরে স্বর্গপ্রবেশ, সমাধি থেকে যীশূর পুনরুত্থান, মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মার জবাবদিহিতা, -এগুলো ভুল হোক, ঠিক হোক - যথার্থ বৈজ্ঞানিক দাবী। হয় যীশূর একজন সত্য সত্যই বাবা ছিলেন নতুবা নয়। যথার্থ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই এর জবাব মিলতে পারে। এটা কোন "নৈতিকতা" কিংবা "মূল্যবোধের" প্রশ্ন নয়, এটা হলো বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা তথা সত্যান্বেষী মননের প্রশ্ন। আমাদের কাছে এটার জবাব দেয়ার মতো সাক্ষ্যপ্রমান হয়তো নেই কিন্তু এটি যে একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন -এতে তো কোন সন্দেহ নেই। তবে বিজ্ঞান যদি অদূর ভবিষ্যতে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো কোন প্রমান খুঁজে পায়, আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন, ভ্যাটিকান সেটিকে উচ্চারনও করতে দেবে না।

যখন মাতা মেরী মারা যান, হয় তখন তার দেহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, নতুবা তার দেহ এই পৃথিবী থেকে স্বসরীরে স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ এর অনুমান, সম্প্রতি ১৯৫০ সালে তারা অধ্যাদেশ জারি করেছেন, যেখানে তারা বলেছেন স্বর্গ জিনিসটার সত্যিকারের 'ভৌগলিক অস্তিত্ব' বাস্তবিকই আছে, নইলে একজন রমনীর শরীর কিভাবে সেখানে গেলো? আমি একথা এখানে বলছি না যে, কুমারী মাতাকে নিয়ে অনুমিত এই মতবাদ আসলেই মিথ্যা, (যদিও আমি বিশ্বাস করি এটি অবশ্যই মিথ্যাই হতে হবে)। আমি শুধু এই যুক্তিই খন্ডন করতে চাচ্ছি যে, যারা বলেন এ ধরণের দাবী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বাইরে রাখতে হবে। বরং, এই কুমারীর এই গল্পটি সত্য কিনা তা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নির্ণয় করা যেতে পারে - এটি তাই পরীক্ষণযোগ্য একটি বৈজ্ঞানিক তত্ব। আমাদের শারীরিক ভাবে মৃত্যু হলে আমাদের আত্মার জবাবদিহি করতে হবে কিনা কিংবা সেই সাথে ফেরেশতাদের দ্বারা বিচারপর্বের গল্প, স্পষ্টতই মাদার মেরীর সাথে যুক্ত হওয়ার অলৌকিক গল্পসমূহ, এবং এধরনের অন্যান্য সব গল্পসমূহ-এর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

প্রায়শই খুব অসৎ মতবাদ অবলম্বন করে বলা হয় যে কোন ধর্মীয় দাবীই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বাইরে। অন্যদিকে এরাই আবার অতি প্রাকৃতিক রং-বেরং-এর গল্প সমূহ, এবং মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলে সাধারন মানুষদেরকে অভিভূত করার চেষ্টা থাকেন, নিজের দল ভারী করে গোপন উপায়ে জেতার চেষ্টা, কিংবা উপসনালয় বৃদ্ধির চেষ্টা থাকেন। এটাই তাদের বৈজ্ঞানিক শক্তি যা তাদেরকে এ সমস্ত গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করার সার্মথ্য দেয়। এবং একই সময়ে সে সব বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক গবেষনা কিংবা নুন্যতম সমালোচনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় - 'এগুলো ধর্মের বিষয়, বিজ্ঞানের এখান থেকে দূরে থাকা উচিৎ।' কিন্তু তুমি গাছেরটাও খাবে - তলারটাও কুড়োবে - এ তো হতে পারে না। অন্তত ধর্মের তাত্বিক আর আত্মপক্ষ সর্মথনকারী্দের এই দুমুখো নীতিকে আমাদের কখনোই প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ না। দূভার্গ্যবশতঃ তারপরো, আমাদের মধ্যে অনেকেই, এমনকি যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না তারাও অম্লান বদনে তাদেরকে একাজ গুলো অহরহই করতে দেই।

আমার মতে, সনাতন কট্টর মৌলবাদীদের বিপক্ষে পোপকে দলে টেনে আত্মপ্রসাদ লাভের একটা প্রচেষ্টা। এতে অবশ্য খুশী হবার মত কারণ আছে - যারা ক্যাথলিক ধর্মের প্রবক্তা যেমন মাইকেল বিহেদের পায়ের তলা থেকে আস্তে আস্তে মাটি সরে যাচ্ছে। তারপরেও যদি আমাকে বলা হয় সত্যিকারের সনাতন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ধর্মগ্রন্থ মেনে চলা সৎ ধার্মিক আর অন্যদিকে কপট, দুমুখোস্বভাবের, গোঁজামিল দেওয়া বক-ধার্মিকদের মাঝ থেকে কাউকে গ্রহণ করতে, আমি জানি আমাকে কোনটা গ্রহন করতে হবে।

তথ্যসূত্র (অনুবাদকের সংযোজন)

1. এল. রন। হার্ভাড Sceintelogy এর প্রবক্তা। ১৯৫০ সাল থেকেই তিনি এ নিয়ে কাজ শুরু করেন যা তিনি ১৯৫২ সালে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। ১৯৫৩ সালে তার এ মতবাদকে তিনি ধর্মের নাম এবং রূপ দেন। ১৯৬০ সালে তিনি Sceintelogy কে এই বলে সংঙ্গায়িত করেন, এ ধর্মনীতির মূল হলো, বিশ্বাস, আচরন আর ঐতিহাসিক পটভূমি আর ধর্মনীতি শব্দটি নিজেই নিজেকে প্রতিফলিত করে। Sceintelogy চার্চ এর অনুসারীরা এ ধর্ম সর্ম্পকে বলেন, "সত্যের শিক্ষা হলো এ ধর্মের মূল কথা"। মূল শব্দটি নিজেই ল্যাটিন শব্দ ***scientia*** এর জোড়া যার মানে হলো "জ্ঞান, দক্ষতা" অর্থ্যাৎ এর মূল ক্রিয়াপদ হলো জানা।

2. সান মুংগ মুন Moonies ধর্মের প্রবক্তা। ইউনিফিকেশন কমিউনিটি চার্চ থেকে ১৯৭০ সালে এ ধর্মের যাত্রা শুরু। এ ধর্মালম্বীরা নিজেদেরকে চাদের সন্তান মনে করেন। ১৯৭৪ সালে মেডিসন স্কয়ার গার্ডেন চার্চের এক সমাবেশের মধ্য দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ ধর্মালম্বীদের সাধনার তিনটি স্তর থাকে, Moonies থেকে সাধনার মাধ্যমে **SUNNIES।** এবং **SUNNIES** এর সাধনা থেকে পাওয়া শক্তি ও ভক্তি তাকে KINGIES এর বা সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাবে, যা সাধনাকে পরিপূর্ন করবে।

ড. রিচার্ড ডকিন্স, আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, গবেষক এবং দার্শনিকদের অন্যতম। পেশায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যুক্তিবাদী এবং সমাজসচেতন লেখালিখির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ড. রিচার্ড ডকিন্সের খ্যাতি আজ আক্ষরিক অর্থেই তুঙ্গস্পর্শী। 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার', 'সেলফিশ জিন', 'আনোয়েভিং দ্য রেইনবো', 'ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইম্প্রোবেবল', 'ডেভিলস চ্যাপ্লেইন' এবং 'অ্যাঙ্গেসটর টেল' সহ অসংখ্য পাঠকনন্দিত জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক বইয়ের রচয়িতা। সম্প্রতি নিজ উদ্যোগে তৈরী করেছেন 'রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন'। তাঁর সর্বশেষ বই - 'দ্য গড ডিলুশন' এখন পর্যন্ত বিগত বাইশ সপ্তাহ ধরে নিউয়র্ক টাইমসের 'বেস্ট সেলার' তালিকায় রয়েছে।

তানবীরা তালুকদার, লেখক এবং নৃত্যশিল্পী। নেদারল্যান্ডস-এ বসবাসরত মুক্তমনার কো মডারেটর। অনেকদিন ধরেই ইন্টারনেট-এ লিখছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ দেশের দৈনিক পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে।
ইমেইল - tanbira.talukder@gmail.com